শত বছরের সন্ধিক্ষণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ফিরে দেখা

ডঃ চিত্রিতা দত্ত সরকার
অধ্যাপিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ, নিউব্যারাকপুর

বিষয় চুম্বকঃ

[শতবর্ষে দাঁড়িয়ে এমন এক সাহিত্য-শিল্পীকে ফিরে দেখা যিনি এবং যাঁর রচনা একই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সমকালের কথা বলে, আবার আজকের কথাও বলে এবং আগামীকালের কথাও তাতে কান পাতলে শোনা যাবে - তিনি সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। তাতে ছোটগল্প উপন্যাস যেমন আছে, তেমনি আছে কিশোর সাহিত্য (টেনিদা), আছে সুনন্দের জার্নালের মত লেখা, আবার সাহিত্য, তত্ত্ব বিষয়ক গুরুগম্ভীর অথচ রসগ্রাহী প্রবন্ধ। তাঁর কথা বলতে গেলে কোন ঘেরাটোপের মধ্যে আলোচনাকে বেঁধে রাখা যায় না। তা বলে একথাও নয় যে , অনেক কথা খরচ করলেই তাঁর আলোচনা সম্পূর্ণ করা যাবে। বড় মাপের প্রতিভার এটাই ধরন। অনেক বলে বলা শেষ হয় না, আবার তাঁর যে কোনো রচনাকে বেছে নিয়ে, তার মধ্যে সর্বকালের উপযোগী ভাষা আবিষ্কার করা যায়। এই প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ', 'হাড়', 'নক্র-চরিত্র', 'দুর্ঘটনা', 'পুষ্করা', 'বনতুলসী', 'রেকর্ড'-এর মতো গল্পগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে সমাজচেতনা, ইতিহাসচেতনা, রাজনৈতিকচেতনা ও মানবতাবোধকে একসঙ্গে অসাধারণ সাহিত্যের রসে জাড়িত করে, অনবদ্য ভঙ্গিমাতে তিনি প্রকাশ করেছেন। এ একমাত্র মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।]

পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশ বা দেড়শোর বাঁকে বাঁকে শিল্পী সাহিত্যিকদের নতুন করে মূল্যায়ন একটা খুব বহুল প্রচলিত রীতি। এটা কি শুধু চলে আসা একটা প্রথাকে মান্যতা দেওয়া না কি অন্য কিছু? আসলে সমকাল পেরিয়েও শিল্পী এবং তাঁর শিল্প কতোখানি জীবন্ত, কাল অতিক্রম করে কালাতীত কিনা এবং নতুন সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁকে কতখানি সম্পর্কিত করা যাচ্ছে, সেই অন্তরঙ্গ প্রয়াস থেকেই এই রীতি। সার্থক শিল্পী কখনও সমকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়না, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মূল্যবোধের প্রেক্ষিতেও অর্থবহ থাকেন তিনি এবং তাঁর শিল্প। কারণ, চিরন্তন কিছু ভাবনা, আশা-আকাঙ্খা, বোধ-চেতনা, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত মানুষের মনে এবং মানবসমাজে বিদ্যামান থাকে, যা কখনো হারিয়ে যায়না। কালের দর্পনে সে ফিরে আসে। আসে হয়ত অন্যরূপ নিয়ে, অন্য মোড়কে কিন্তু অন্তর্বচনটি থাকে একই। শুধু তাকে চিনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয়।

জানুয়ারী ২০১৭তে পূর্ণ হল গল্পকার, উপন্যাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, ছাত্র-প্রিয় অধ্যাপক, টেনিদার অবিস্মরনীয় স্রষ্টা, সুনন্দের জার্নালের সুনন্দ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শতবর্ষ, যিনি সব ভূমিকাতেই অবিস্মরনীয় স্রষ্টা — তাঁর সৃষ্টি আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং বলা হয় সময়ের অভিঘাত পেরিয়ে তা আরও তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। এসেছে তাতে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে কিছু বলতে গেলে দ্বিধা জাগে কোন জায়গা থেকে তাঁর আলোচনাকে আরম্ভ করব, তাঁর কোন বিষয়টি বা আলোচনার অন্তভুক্ত করব। তাঁর ভাবনা তাঁর সমকালকে সঙ্গে নিয়ে সর্বকালের, দেশীয় ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হয়েও সব দেশের এবং সব শ্রেণীর মানুষই নিজেকে খুঁজে পাবে তাঁর রচনার মধ্যে। তাঁর গদ্যের অবারিত গতি, অনবদ্য উপস্থাপনা, একেবারে অচেনা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রমী বিষয় নির্বাচন, ইতিহাস চেতনা, বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস, সাহিত্যের প্রকরণ-রীতি সম্পর্কে অশেষ জ্ঞান তাঁকে একজন ব্যতিক্রমী শিল্পী করে তুলেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অবশ্যই অগণিত গল্পের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটিকে নিয়ে একটা ছোট পরিক্রমার প্রয়াস এই প্রবন্ধটি। আলোচনার পরিসর যেখানে অনেক বড়, তাকে নির্বাচিত গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে ফেলা সত্যিই খুব কঠিন। কারণ কোনটিই কারোর মত নয়। স্রষ্টা এক হলেও তাঁর সৃষ্টি বহু বৈচিত্র্যময়। তবে নিবিড় পাঠে একটা জিনিস উপলব্ধি করা যায় যে কাহিনী নির্বাচন যেমনই হোক, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সেগুলির জন্ম। এদের পটভূমি বাস্তব, চরিত্ররা উঠে এসেছে চেনা জগৎ থেকেই এবং দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিভূমিতেই যা সর্বকালেই প্রযোজ্য।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে জন্ম নিয়ে (প্রকৃত ছোটগল্প) বহু বহু সফল ছোট গল্পকার এসেছেন, তাঁদের রচনা বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বমানে পৌঁছে দিয়েছে। সেই বিচারে কে কার থেকে এগিয়ে রয়েছেন তা বিচারের চেষ্টা অনেকটা অন্ধের হস্তী দর্শনের মত। একজন স্রষ্টার কোনো কোনো শিল্পকর্ম আমাদের এতটাই মুগ্ধ করে, যে তাতেই আমরা বিবশ হয়ে থাকি। তবু এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ যেন আমাদের ভেতর থেকে নাড়িয়ে দেন আকস্মিকতায় আমরা বিহ্বল হয়ে পড়ি, মুগ্ধতার সঙ্গে এক ধরনের স্তব্ধতা আমাদের আচ্ছন্ন করে। বাস্তব না কি গল্প, না কি একই সঙ্গে বাস্তব এবং গল্প। আমাদের মনের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন তেমনই ছোটগল্পকার যিনি শুধু পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করেন না, পাঠককে চমকিত করেন, পাঠকের চোখের সামনে খুলে দেয় জীবনের এক একটি দিক, এক একটি অধ্যায়। পাঠকের ছোটগল্প পাঠের সব সংস্কারকে ভেঙে, জীবনের অবিশ্বাস্য চূড়ান্ত সত্যের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে 'মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের পটভূমিতে' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিকাশ। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় 'সেদিন সর্বগ্রাসী যুদ্ধের অভাবে ভেঙে পড়েছে জীবনের খেলাঘর, ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর

বীভৎস চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস; একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাগজিমুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারের নারকীয় অনাচারে পর্যুদস্ত দিনযাত্রা; সারা বাংলা জুড়ে নিরন্ন বিবস্ত্র নরনারীর গগনভেদী হাহাকার; আর তারই বুকে বসে মুনাফা শিকারী মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টহাসি। মহাপ্রলয়ের সন্ধিলগ্নে যেন নরক গুলজার'। এই অবস্থাটাকে মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের প্রেক্ষাপট। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি সাহিত্য শিল্পের যদি নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রেক্ষাপট থাকে, তাহলে কালের বিচারে তা হারিয়ে যেতে বাধ্য। তবে কি শিল্পী সমকালের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না? নিশ্চয়ই হবেন তবে সেই সব সমকালীনতার প্রেক্ষিতে, যেগুলো সমকালীনও আবার- চিরকালীনও বটে। আপাত বিন্যাসটা হয়তো পাল্টে পাল্টে যায়, কিন্তু মূল সুর ও স্বরটা থাকে একই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে কখনও মনে হতে পারে মানিক-জগদীশের উত্তরসূরী। কিন্তু আসলে তিনি এর কোনটিই নন। সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ছাঁচে ঢালা নন, আর এইখানেই তিনি অনবদ্য, অতুলনীয়, একেবারেই নিজের মতো। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি গল্প দিয়েই পাঠককে চিনিয়ে দেন, তাঁর এক অস্তিত্বের আড়ালে বহুসত্তার।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এমনই এক শিউরে ওঠার মতো গল্প 'টোপ'। হান্টিং বাংলোর পেছনে চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের নিবিড় অরণ্য। রামগঙ্গা এস্টেটের রায়বাহাদুর সেখানে শিকারে যান। শিকার না পেয়ে সেখানে কপিকলের যন্ত্রের সাহায্যে জীবন্ত মানব শিশুর টোপ দিয়ে বাঘ শিকার করেন। কারণ তাঁর চোখে 'একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই'। এই রকম রায়বাহুদুরেরা এখন হয়ত আর নেই; কিন্তু এদের মতোই নৃশংস, ক্ষমতালোভী, মানসিক বিকারগ্রস্ত তথাকথিত ক্ষমতাশালী মানুষেরা কি আমাদের চারপাশে নেই, যারা নিঃস্ব সাধারণ অসহায় মানুষকে নানাভাবে টোপ বানিয়ে নিজেদের লোভ লালসা চরিতার্থ করে?

তবে এই গল্পের দুটো দিক আছে। একটি রায়বাহাদুরদের হিংস্রতার দিক হলে, অন্যটি কথকের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী সুযোগ-সন্ধানী, স্বার্থপর মানুষেরা। 'টোপ' গল্পে যখন কথক আবিষ্কার করে, রায়বাহাদুরের শিকারের টোপটি একটি মানব শিশু তখন তার পায়ের নিচটা থরথর করে কেঁপে ওঠে, আর আমাদের পাঠকের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যায় ভয়ের একটি শীতল স্রোত, কিন্তু তার পরেই সে ভাবে, 'বন্ধুরা বলে মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষা, তা আমি পরোয়া করিনা। নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাট ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ'। একেবারে সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত চরিত্র। সে প্রাথমিক ধাক্কা খেলেও পরে ভাবে, 'আটমাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম'। এই ছেলেটির কোনো নাম নেই। কারণ এরা শুধু তখন ছিলনা, এখনো আছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এইসব মধ্য এবং নিম্নমধ্যবিত্তরা ঘটে যাওয়া

কত অন্যায়, অপরাধ, অবিচারের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকে এবং যাদের তোষামোদ করলে নিজেদের কার্যসিদ্ধি হতে পারে নির্লজ্জভাবে তাদের তোষামোদ করে। সুতরাং গল্পটি প্রাসঙ্গিকতা হারায় না।

আসামে বিহারী-অসমীয়া দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে রচিত 'বীতংস' গল্পটি। 'আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে। আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই'। এই কুলি সরবরাহ করত আড়কাঠি সুন্দরলাল। এইভাবে বিহারের আদিবাসী বা সাধারণ গরিব মানুষ দলে দলে এসেছে আসামে। তবে তাদের আর নিজেদের দেশে ফেরা হয়নি। বীতংস গল্পে আড়কাঠি সুন্দরলাল গ্রামের সব সাঁওতালদের সরলতার সুযোগ নিয়ে, তাদের আসামের চা-বাগানে কুলি হিসেবে চালান করে দেয়। কারণ সে নানা ছলনায় সাঁওতালদের বশ করে নিয়েছিল। আর তার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করে সুন্দরলাল। কিন্তু প্রশ্ন আজকের সমাজেও কি সুন্দরলালেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে না? নিরীহ অসহায়, নিরন্ন, ভূমিহীন, জমিহীন খেতে না পাওয়া মানুষেরা কি অসহায় ভাবেই আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় না সুন্দরলালদের কাছে? সময় যতোই পেরিয়ে যাক, সভ্যতা বিবর্তিত হোক্, তার পাশাপাশি হতভাগ্য মানুষদের শোষিত হবার কাহিনী কিন্তু থাকবেই।

'গোলপাড়া হাটের সে জাঁদরেল মহাজন; শুধু সোনাদানা, ধানচালের আড়ৎ, কাটা কাপড়ের ব্যবসা। গোলপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডেরও সে প্রেসিডেন্ট, সদর থেকে ছাপানো সব সরকারি খাম আসে তার নামে। তা ছাড়া হাবিগঞ্জ থানার ইব্রাহিম মিঞাকে সে যে কী মন্ত্রে বশ করেছে কে জানে, পুলিশের হাঙ্গামা থেকে অন্তত নিশ্চিত।

এই লোকটি নিশি কর্মকার, আর্কেটাইপাল character নিশি ডাকাতদের কাছ থেকেও সোনাদানা কিনে নেয় এবং কখনো কখনো ডাকাতদেরও বোকা বানাত। আর এক দিকে সেবাদাসী বিশাখা। নিজের এবং তারই মতো তার অতিথিদের বিনোদনে নিযুক্ত। দুর্ভিক্ষের বাজারে আটশো মন চাল গুদামে লুকিয়ে রাখে নিশি, অনেক বেশি দামে বেচে দেবে বলে। এবং মিলিটারি contract পেয়ে তার সেই উদ্দেশ্যও পূরণ হয়। এদিকে না খেয়ে মরছে দরিদ্র মানুষের দল। নিশিকান্ত তার ব্যাখ্যা দেন, না খেয়ে মরছে, সে তো কৃতকর্মের ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দেনা এ জন্মে শোধ করতেই হবে'। (নক্র চরিত্র)।

আজ এই জোতদার, আড়ৎদারেরা এই চেহারায় নেই, কিন্তু তীব্র অর্থ লালসা থেকে মানুষকে শোষণ, নানা অন্যায়, বেআইনি কাজে যুক্ত হওয়া, সমাজবিরোধী কাজ করা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোন অন্যায়কেই অন্যায় মনে না করে, নিজের একটা তথাকথিত ভালোমানুষ ভাবমূর্ত্তি তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছে- এর দাম বহু মানুষকেও দিতে হচ্ছে। আজকেও সমাজের আনাচে কানাচে, কখনো মানুষের চোখের সামনেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। চারপাশে একটু চোখ রাখলেই এরকম বহু মানুষ প্রতিনিয়ত আমাদের চোখে পড়ে।

এরকমই একটি শ্রেণি বৈষম্য, শোষকের নির্মম শোষণ, শুধু শোষণই নয়, নির্মম ঘৃণা ঝরে পড়ার একটি গল্প 'হাড়'। গল্পটির চরিত্র কথক এবং তার পিতৃবন্ধু। কথক তাঁর কাছে এসেছে চাকরির

উমেদারী করতে। 'টোপ' গল্পের রায়বাহাদুরের মতো এই গল্পেও আছে ধনী, অহংকারী, মনুষ্যত্ব বর্জিত আরেক রায়বাহাদুর। রায়বাহাদুরের শখ ছিল বিচিত্র সব হাড় সংগ্রহ করা। তিনি হাড় পেয়েছেন কিন্তু মন্ত্র না পাওয়ায় জাদুবিদ্যা আয়ত্ব করতে পারেন নি। চাকরি প্রার্থী দরিদ্র বন্ধু পুত্রটিকে চাকরির বদলে adventure এর পরামর্শ দিয়ে বিদায় করেন। মানুষের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও মনুষ্যত্বহীনতার চূড়ান্ত নজির সামনে আসে। এমন মানুষদের হাতেই তো সমাজ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। সে কথাটি এ গল্প রচনার সময় যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্যি। তাই ঐ কাহিনী আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই শোষণ দিয়েই গল্পটি শেষ হয়নি সমাজ পরিবর্তন, সমাজ বদলের কথা লেখক উচ্চারণ করেছেন গল্পের শেষে। 'ওই কালো আকাশের রঙ আগুনের মত লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ জড়িত মিঠে হাওয়ায় ঝড়ো আগুনের ঝলক কবে লক্‌লক্‌ করে বয়ে যাবে'।

শুধু শোষণের কথা নয়, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের রুখে দাঁড়ানোও কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে। বিদ্রোহ থামে কিন্তু বিপ্লব থামে না। কারণ বিদ্রোহ বাইরের, একদিন তাকে থামতেই হয়। বিপ্লব অন্তরের, বিপ্লব স্বপ্নের- তাই মানুষের মনে, ভাবনায়, অনুভূতিতে, বোধে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। এই বিপ্লব, নিগৃহীত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হতে পারে, হতে পারে স্বাধীনতার জন্য, কিংবা মনুষ্যত্বহীনতার বিরুদ্ধে।

'রেকর্ড' গল্পটি মানুষের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা, এমন এক বিপ্লবেরই গল্পরূপ। এক অধ্যাপক দম্পতির হাতে আসে একটি রেকর্ড। কিন্তু শোনার পরে বুঝতে পারল এটা সাধারণ রেকর্ড নয়। আবার এই আপাত দুর্বোধ্য রেকর্ডটি এদের কোন এক অজানা অনুভূতিতে অস্থির করে তোলে। কখনো তাদের মনে হয় এটি বন্য প্রকৃতির আহ্বান, কখনো মনে হয় পাহাড়, ঝর্ণা, অরণ্যের হাতছানি, কখনো আবার মনে হয় সাঁওতালি গ্রামের নাগরা টিকারার বোল, মনে হয় যেন যুদ্ধের ডাক।

এক বন্ধুর থেকে জানা গেল এই ভাষাটি স্লাভ ভাষা। অবশেষে এক ভূ-পর্যটকের থেকে জানা গেল নাৎসীদের দানবিক অত্যাচার রুখতে এ এক বিপ্লবের গান, স্বাধীনতার মন্ত্র। রেকর্ডগুলো তৈরি ও বিক্রি হয়েছিল গোপনে। এই গানের প্রত্যেকটি শিল্পীই নাৎসীদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। গল্পকার একটি আপাত সাধারণ বাক্য লিখে, রেখে গেলেন তার মধ্যে একটি অসামান্য ঈঙ্গিত। বাক্যটা 'হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল, এর প্রত্যেকটি কপি অরিজিনাল- এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ এই রেকর্ড পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে'। কারণ বিপ্লবীর মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু বিপ্লব মরে না। বিপ্লবের আগুন জ্বলে ধিকিধিকি। এই বিপ্লব নির্দিষ্ট কোন দেশ বা ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। এটা সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তাই ভাষা না জানলেও, অর্থ না বুঝলেও অধ্যাপক দম্পতি যে সব চেনা সুরের সাথে তার মিল পাচ্ছিল, তার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে একটা স্বাধীনতার সুর। যে দেশের মানুষ হোক, এই সুরটি চিনে নিতে ভুল হয়না মানুষের। 'দেশে দেশে কালে কালে এ সুর এক। জানতুম আমরাও ঐ সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন

চিনতে পারিনি'।

শোষণ-শাসন বিপ্লবের গল্পের পাশাপাশি মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের একটি উপাদান। নানা দিক থেকে এর উপর আলো ফেলেছেন গল্পকার। কারণ সমাজগঠিত ব্যক্তিকে নিয়ে, আবার প্রতি ব্যক্তিই একজন সামাজিক প্রাণী। তাই কোন কোন গল্পে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আপাত ব্যক্তিকেন্দ্রিক গল্প রচনা করেছেন যার মধ্যে দিয়ে ঈর্ষাপরায়ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই প্রতিফলন ঘটেছে। এর একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'দুর্ঘটনা' গল্প। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র ইন্দিরা চৌধুরী। ষ্টীমার যাত্রার সময় সে শুনতে পায় নব দম্পতি বিভাস আর ইলার প্রেমালাপ। কুরূপ ইন্দিরা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। রূপহীনতার কারণে তার জীবনে প্রেম বিবাহ কোনটিই আসেনি। 'স্কুল মিস্ট্রে'স কুরূপ মিস্ ইন্দিরা চৌধুরির বুকের ভেতরটা অকারণে পুড়ে যাচ্ছে। রক্তের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ– ষ্টীমারের প্যাডেলের অশান্ত ঘাত-প্রতিঘাত'। নবদম্পতির সাথে আলাপ জমিয়ে সে একটা কল্পিত গল্প বলতে আরম্ভ করল। সে গল্পের নায়কের নামও বিভাস এবং সেও ইলার স্বামীর মত একজন ডাক্তার। গল্পের নারী চরিত্রটি লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর একটা নামও তো ইন্দিরা। গল্পের নায়ক বিভাস লক্ষ্মীর স্বামীর যক্ষারোগের চিকিৎসা করতে এসে লক্ষ্মীর প্রতি আসক্ত হন। লক্ষ্মীর স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি লক্ষ্মীকে পেতে চাইলে সে বিভাসকে প্রবলভাবে প্রত্যাখান করে। বিনিময় বিভাস লক্ষ্মীর হাম নিরাময়ের জন্য মুখে মাখার ওষুধের নামে অ্যাসিড দেন। তা থেকেই চিরকালের জন্য ইন্দিরার মুখ পুড়ে গেল।

ইন্দিরা যা করতে চেয়েছিল, বানানো গল্প বলে তাই করে ফেলল। চিরকালের মতো ইলার মনে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিল। তিক্ত হয়ে উঠল তাদের দাম্পত্য। আর ইন্দিরার মন ভরে গেল এক পরম তৃপ্তিতে। 'নিজের সব ভেঙে গেছে বলেই যা কিছু সুন্দর দেখতে পায় তাকেই কি তার ভাঙতে ভালো লাগে? তার মুখখানা আসলে পুড়ে গিয়েছিল কোন ডাক্তারের দেওয়া অ্যাসিডে নয়, নিছক একটা স্টোভ দুর্ঘটনাতেই। মানব মনের গভীর অন্ধকারকে তুলে এনেছেন লেখক অদ্ভুত নাটকীয়তার মধ্যে। চম্‌কে, নড়েচড়ে ওঠে পাঠক।

'পুষ্করা'ও এমন একটি অন্ধকার মনের গল্প। কলেরার মড়কে গ্রাম উজার হয়ে যাচ্ছে। পুরোহিত তর্করত্ন কলাপাতায় সাজিয়ে দিয়েছেন শিবাভোগ। পুষ্করা থেকে গ্রাম বাঁচাতে আয়োজন করা হয়েছে শিবাভোগ হিসাবে স্তুপকার লুচি-মাংস। উদ্দেশ্য শিয়ালের বেশে দেবী এসে গ্রহণ করবেন, মড়ক থেকে বাঁচবে গ্রামের মানুষ। হঠাৎই তর্করত্ন দেখলেন, 'শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দুহাতে সে শিবাভোগ গোগ্রাসে খাচ্ছে'। দেখা গেল এক নারী মূর্তিকে। তর্করত্ন বিশ্বাস করলেন স্বয়ং দেবী এসেছেন। পরে জানা গেল ডোমপাড়ার পাগলি পঞ্চাশের মন্বন্তরে হারিয়েছে তার তিন ছেলে আর স্বামীকে। কিন্তু এই মন্বন্তর মানুষের তৈরি। ক্ষেতে ধানের অভাব নেই, কিন্তু আপামর সাধারণ মানুষ নিরন্ন কতিপয় অর্থ পিশাচ, লোভী, মনুষ্যত্বহীন মানুষের জন্য। এদেরকে মানুষ বলাই যথার্থ নয়। ডোমপাড়ার পাগলি, 'দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাবোগ সহ্য করতে পারেনি'। মানুষের হাতে

মানুষের এই পরিণতি, চিরকালের শ্রেণী বিভাজন, শ্রেণী দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে প্রোলেতারিয়েতদের নিগ্রহ।

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম গল্প 'বন তুলসী'। তিনটি কন্যাসন্তানের পিতা বিমলেন্দু হঠাৎই উপলব্ধি করে বিয়েতেই জীবনের রোমান্সের সব শেষ। 'তার চাইতে অনেক ভালো একটা খোলা আকাশ একটা অবারিত দিগন্ত, মিষ্টি মহুয়ার ফল, কালো সাঁওতালের মেয়ে'।

বিমলেন্দু ফিরে যায় কৈশোরে। তাকে আকর্ষণ করত বনতুলসীর গন্ধ। মাছ ধরার জন্য সে বসে থাকত বন-তুলসীর ঝাড়ে। মাঝে মাঝে বনতুলসী দুহাতে ডলে তার গন্ধ শুঁকতো বিমলেন্দু। পরে শহরে এসে জীবন পাল্টে যায়। বহুদিন পরে বন্ধুর অনুরোধে উত্তরবঙ্গে এসে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে সে দেখল আনমনে স্নানে ব্যস্ত একটি পূর্ণ যৌবনা সাঁওতাল মেয়েকে। মনে পড়ে যায় এমনই এক মেয়েকে দেখেছিল অরণ্যের মধ্যে তার কৈশোর বেলায়। লেখক যেন নিজের অজান্তেই ঢুকতে থাকে বনতুলসীর ঝাড়ে। তারপর একসময় বেরোবার পথ হারায়। একটা ঘোর এসে তাকে গ্রাস করল। চিরকালই যেন সে থেকে যাবে এই বনতুলসীর ঝাড়ে। এটা কি প্রেমের গল্প না কি প্রকৃতি প্রেমের গল্প, নাকি মানব মনের গভীর সংরাগ ও কামনার প্রতীকী কাহিনী? কোনটিই আলাদা করে নয়, সবগুলোই মিলেমিশে একাকার হয়ে পাঠককে বাস্তব জগৎ থেকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায় যে জগৎটা ঠিক চেনা নয়, আবার অচেনাও নয়। কল্পনা আর বাস্তব মিলেমিশে আর একটা নতুন জগৎ, নতুন জীবনের বার্তা।

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ছোট গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটা স্বল্প পরিসরের মধ্যে ধরা যাবে সাধারণ পাঠক হিসেবে কখনোই তা মনে করিনা। তবু কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প বেছে নেবার চেষ্টা করেছি, কারণ প্রতিটি গল্পকেই বলা যায় সামান্যের মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনা। সত্যি কথা কি তাঁর প্রত্যেকটি গল্পই তাঁকে আলাদা আলাদা ভাবে চিনিয়ে দেয়। তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার কথা প্রমাণিত হয় তাঁর ছোটগল্পের ভাণ্ডার থেকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়র আগে, পরে এবং সমকালে বাংলা সাহিত্যে বহু ছোট গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা স্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্বল। আমরা আগেই বলেছিলাম সংখ্যাগত বিচারে এবং গুণগতমানে বাংলা ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। তবু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সেই ধরনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত, যার মধ্যে একদিকে যেমন আছে ছোটগল্পের স্বাভাবিক, পরিচিত বৈশিষ্ট্য, তেমনি অন্যদিকে আছে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র করে। কারণ কোন আদর্শ শিল্প নমুনা কখনও শুধুমাত্র কতগুলি ছক বা প্রকরণ ধরেই চলে না, সাথে শিল্পীর স্বাধীনতা যুক্ত হয়ে তা অনবদ্য হয়ে ওঠে। ছোটগল্পের সংখ্যা ঠিক করে ছোটগল্প রচিত হয়নি, রচিত হবার পর তা ছোটগল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছকে চলতে চলতে ছক ভেঙে নতুন ধরন ও ভাষ্যের মধ্যে ঢুকেছেন, যেটা তাঁর ছোটগল্পের একান্ত নিজস্ব ভুবন এবং সেখানেই তিনি স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভাবতে গেলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং শ্রেণী থেকে

কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচন করেছেন। কালনিষ্ঠ শিল্পী যেমন সমকালের যুদ্ধদাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ কবলিত প্রেক্ষাপটে গল্প লিখেছেন, তেমনি এগুলিকে আশ্রয় করে তিনি শেষ পর্যন্ত একটা চিরন্তনতায় পৌঁছে যা দেশ-কাল নির্বিশেষে সত্য। চরিত্র বাছতে গিয়ে জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারী, চা বাগানের কুলি, এস্টেটের মালিক, পুরোহিত, শিক্ষিত, বনবালা, সাঁওতাল রমণী, ভূ-পর্যটক, ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মানুষকে গ্রহণ করেছেন। কোন একটা শ্রেণীর মধ্যে তাঁর নির্বাচন থেমে থাকেনি, সমাজের সব স্তর থেকে তিনি চরিত্র নির্বাচন করেছেন। ছোটগল্পে এত বিচিত্র চরিত্র বিন্যাস কমই চোখে পড়ে।

তাঁর উপস্থাপনা পদ্ধতিতে ছিল আশ্চর্য ভঙ্গিমা। বহুমাত্রিক চরিত্র নির্মাণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনবদ্য। সেই জন্য তাঁর চরিত্ররা সমকালের মধ্যে ফুরিয়ে যায় না, চিরকালের হয়ে থাকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেন, কিন্তু কখনোই তাঁরা শিল্পীর অঙ্গুলি হেলনে চলাফেরা, নড়াচড়া করে না। চরিত্রগুলি স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে, আর তাই বাস্তবতাও পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। আসলে চরিত্র নির্মাণে তিনি ছিলেন নির্মোহ অথচ দরদী শিল্পী। অত্যন্ত যত্নে চরিত্রগুলি নির্মিত, অথচ চরিত্রগুলির উপর শিল্পীর মোহ চেপে বসেনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে চরিত্র এবং গল্প বা ঘটনা সমগুরুত্বে উপস্থাপিত। কোন একটি অন্যটির প্রভু হয়ে বসেনি। তাঁর ছোটগল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সমাজচেতনা। তাঁর বর্ণনা ও চরিত্রায়নে কোন অতিকথন নেই। চরিত্রর বৈশিষ্ট্যর কথা বলতে গিয়ে তিনি কখনও বেশি কথা খরচ করেন নি।

ছোটগল্পে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কখনো নিজেকে দু'একটি চরিত্রের মধ্যে আটকে রাখেনি, কাহিনীর প্রয়োজনে যতোগুলি চরিত্র প্রয়োজন ততোগুলিই নির্মাণ করেছেন। আবার অকারণে অনেক চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতাও তাঁর ছিল না। ছোটগল্প সাধারণত একচরিত্র প্রধান। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়োজনে এক চরিত্রের বদলে সমষ্টি চরিত্র সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তাতে গল্পে কোন হানি ঘটেনি। আর এটাই তো স্বাভাবিক যে গল্পের চাহিদা অনুযায়ী গল্পের দৈর্ঘ্য বা চরিত্র সংখ্যা হবে।

সব মহৎ শিল্পীরও কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। সেই দিক থেকে বিচার করলে নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, একদিকে যেমন টানটান উৎকণ্ঠা বজায় থাকে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে একটু বেশি ব্যাখ্যা করার প্রবণতা, শেষের পরেও দু-একটি সিদ্ধান্ত সূচক বাক্য ব্যবহারের প্রবণতা বলা যায় তাঁর এক ধরনের দুর্বলতা। ঈঙ্গিতময়তা যে ছোটগল্পের সমাপ্তির একটি অন্যতম শর্ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ব্যহত হয়েছে। তবে ব্যঞ্জনাময়তার শেষ না হলেও তাঁর 'টোপ', হাড়, দুর্ঘটনা গল্পগুলোতে একটি নিশ্চিত সমাপ্তি সত্বেও শেষ হবার পরও পাঠক এক অপার বিস্ময় আর বিহ্বলতার পারে দাঁড়িয়ে থাকে, আর এখানেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনবদ্য, অতুলনীয়, অনন্য।

গ্রন্থ ঋণ ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলি,/উজাগর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা